০৮-০৮-১৮ : প্রাতঃমুরলী ওঁম্ শান্তি! "বাপদাদা" মধুবন।

"মিষ্টি বাচ্চারা - পুরানো এই দুনিয়া এবার মাটিতে মিশে ধূলা-ভষ্মে পরিণত হবে। অতএব এই ধূলা-ভষ্মের দুনিয়ায় নিজেদের বুদ্ধির-যোগ যেন আটকে না যায়"

প্রশ্ন : - মানুষের কি এমন চাহিদা যা একমাত্র এই বাবা পূরণ করতে পারেন ?

উত্তর : - মানুষ তো শান্তি-ই চায়। কিন্তু তাদের কে এমন অশান্ত বানায়-সেটাই জানে না তারা। একমাত্র বি.কে.-রাই তাদেরকে বোঝাতে পারবে, কিভাবে ৫-বিকার তাদেরকে এমন অশান্ত করে রাখে। ভারতে শান্তি তখনই ছিলো, যখন ভারত ছিলো পবিত্র। এখন আবার বাবার সাহায্যে পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গের স্থাপনা চলছে-যেখানে সুখ-শান্তি সবকিছুই থাকবে। একমাত্র এই বাবা ছাড়া অন্য আর কেউই মুক্তি-জীবনমুক্তির দিশা দেখাতেই পারে না।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে
. অন্য কোনও সুখের দুনিয়ায়
. মোদের নিয়ে চলো বাবা .....

ওঁম্ শান্তি! কাদের সৎসঙ্গ এটা ? লোকেরা যখন সৎসঙ্গে যায়, সেখানে কোনও না কোনও সাধু-সন্ত, মহাত্মা ইত্যাদিরা নিজের আসনে বসে শাস্ত্র ইত্যাদি শোনাতে থাকে। যদিও সেখানে কোনও নির্দ্দিষ্ট লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এসব কিছুই থাকে না। সৎসঙ্গ থেকে যে তাদের কি যে প্রাপ্তি হয়- সেটাই জানা নাই কারও। সেখানে আবার এমনও নয় যে, কেবলমাত্র গুরুদের শিষ্যরাই আসে, যে কেউ সেখানে গিয়ে বসতে পারে- তা সে শিষ্যই হোক বা অন্য যে কেউ হোক, এমন কি যে কোনও ধর্মেরই হোক। যেই তারা শোনে, অমুক মহাত্মা এসেছেন, দৌঁড়ে চলে যায় সেখানে। একেই বলে সৎসঙ্গ। সেইসব মহাত্মারা কোনও না কোনও বেদ বা শাস্ত্রের কথা শোনায়। কিন্তু বাস্তবে সত্য-পরমাত্মা তো কেবল একজনই। বাকীরা সবাই জীবাত্মা অর্থাৎ মনুষ্য। একমাত্র সত্য-পরমাত্মাই সত্য কথা শুনিয়ে সাধারণ মনুষ্য অর্থাৎ নর থেকে নারায়ণ বানান। যেই সত্য-নারায়ণের ব্রতকথা শোনানো হয় পূর্ণিমা তিথিতে। এখন তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারো প্রকৃত পূর্ণিমা হলো -বর্তমান জগতের এই-তমসাচ্ছন্ন রাত থেকে আত্মাদের আলোর দিশায় নিয়ে আসা। আর তা হতে গেলে তোমাদের হতে হয় ১৬-কলা সম্পূর্ণ। জ্ঞান-সূর্যের কখনই গ্রহণ লাগতে পারে না। গ্রহণ তো লাগে জাগতিক সূর্য-চন্দ্র ইত্যাদিদের। যারা স্থুল রূপে পৃথিবীকে আলো দেয়। আর জ্ঞান-সূর্য সবাইকে জ্ঞানের আলোর দিশা দেখায়। তারই মহিমাতে গীত-ও গাওয়া হয় - "জ্ঞান-সূর্য প্রকট হলো, অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হলো .....!" তোমরা সবাই সেই জ্ঞান-সূর্যেরই সন্তান যারা বসে আছো এখানে। বাইরের কারও প্রবেশ নিষেধ এখানে। যেহেতু তারা এর অর্থই বুঝতে পারবে না। তাই বাবা বলছেন - "বাচ্চারা, আমি আসি তোমাদের সামনে। এসে তোমাদেরকে পাপাত্মা থেকে পুণ্যাত্মায় গড়ে তুলি। মন্দিরের আসনে বসাবার উপযুক্ত করে তুলি। তোমাদের আগামী ঐ দুনিয়া যে পবিত্র শিবালয়। শিববাবা যে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন, তাতে থাকে কারা ? -- অবশ্যই দেবী-দেবতারা। যাদের চিত্রাদি মন্দিরগুলিতে রাখা আছে। তোমরা তো জানো, ৫-হাজার বর্ষ পূর্বে এই ভারতেই

সেইসব দেবী-দেবতারা সেই স্বর্গ-রাজ্যে রাজত্ব করতেন। কিন্তু, কখন তারা রাজত্ব করেছিলেন, কিভাবে সেই রাজ্য-ভাগ্য লাভ করেছিলেন, দুনিয়াদারীর লোকেরা তার কিছুই জানে না। অথচ বাচ্চারা, তোমরা কিন্তু তা জানো। সেটা হবে নতুন দুনিয়া, আর এটা হচ্ছে ঝড়ঝড়ে পুরোনো দুনিয়া।

একমাত্র ভারতবাসীরা বলে থাকে ভারত আবার হবে নতুন দুনিয়া, নতুন ভারত, ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি রাজ্য। আত্মাদের মন-বুদ্ধিতেও কিন্তু তা আছে- এখানেই সেই দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিল। কিন্তু অজ্ঞানী হতভাগ্যরা এটাই সঠিক ভাবে জানে না যে, সেই অলমাইটী অথরিটির রাজ্য কখন আর কে তা স্থাপন করেছিলেন ? কোনও না কোনও সময়কালে তা ছিল অবশ্যই। তারা এটাও কিন্তু জানে- এই ভারতই একদা সোনার পাখীর যুগ ছিল। বাচ্চারা, এখন তোমরা কার সামনে বসে আছো ? কোন্ মহাত্মা এসেছেন তোমাদের কাছে ? শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু এমন বলতে পারে না-"ভগবান উবাচঃ, আমিই তোমাদের রাজযোগ শিখিয়ে থাকি।" বাচ্চারা, এখন তোমাদের বুদ্ধির তালা খুলে গেছে। তোমরা বুঝতে পেরেছো, এই পুরোনো ঝড়ঝড়ে দুনিয়ার যাবতীয় যা কিছু, তা সবই ধূলা-ভস্মে পরিণত হয়ে মাটিতেই মিশে যাবে। শান্তির আকাঙ্খা তো আছে মানুষের, কিন্তু কে করতে পারে সেই শান্তি স্থাপন ? বাচ্চারা, প্রথমেই তাদের কাছে জানতে চাইবে, কার কারণে তোমরা আজ এত অশান্ত ? তারা যদি তার সঠিক উত্তর দিতে না পারে, তখন তাদের বোঝাও, এই বিকারের কারণে আজ তোমরা এত অশান্ত। ভারতে একদা খুবই শান্তি ছিল, যখন এই ভারতে ছিল পবিত্রতা। 'পবিত্র প্রবৃত্তি-মার্গে'-র মানুষেরা ছিল খুবই সুখী। কিন্তু, এখন তারা অপবিত্র, আর যেহেতু তারা 'পতিত-প্রবৃত্তি মার্গ'-এর অনুসারী। যথেষ্ট প্রমাণও আছে তার - যখন মন্দিরে গিয়ে দেবতাদের মহিমা-কীর্তন করে, তখন নিজেরাই নিজেদেরকেই নীচ-পাপী বলে, এমনও বলে - আমারা এখন গুণহীন, কোনও গুণই আর নেই মোদের। লোকেরা নিজেরাই তা গায়, অথচ প্রকৃত জ্ঞানের বিষয়ে তাদের কোনও ধারণাই নেই। আত্মাদের বাবা পরমাত্মা স্বয়ং আসেন, তার বাচ্চাদের প্রতি বাবার কর্ম-কর্তব্য করতে। এখানে কোনও সাধু-সন্ন্যাসী বা এমন কেউ এসে বসেন না। যেহেতু ইনিও (ব্রহ্মা) দেহধারী, তাই তোমাদের নজর কিন্তু থাকবে উর্দ্ধপানে। তোমরা যা কিছুই শোনো, তা কিন্তু স্বয়ং শিববাবার থেকেই (ব্রহ্মার মাধ্যমে)। তাই দৃষ্টি যেন না যায় কেনও দেহধারীর প্রতি।

কৃষ্ণও (তোমাদের মতন) এক দেহধারী বাচ্চা। তাকেও মাতার গর্ভে জন্ম নিতে হয়। প্রত্যেক আত্মারই নিজ নিজ দেহ থাকে। একমাত্র শিববাবারই নিজস্ব কোনও দেহ নেই। যার যা নাম করা হয়, তা তো দেহের উপরেই। আত্মার উপরে কিন্তু কোনও নাম হয় না। আত্মার বেলায় বলা হয়, মহান-আত্মা, পাপ-আত্মা .....! কিন্তু এমনটা কখনই বলা হয় না পাপ-পরমাত্মা। অতএব কেউ নিজেকে পরমাত্মা বলতেই পারে না।পরমপিতা পরমাত্মা তো কেবল একজনই। যিঁনি পরম পিতা, পরমধাম নিবাসী। তাকেই তোমরা পরমাত্মা বলো। পরম এই কারণে - উঁনি হলেন নিরাকার। সবকিছু মিলিয়ে ওনাকে বলা হয় - পরমাত্মা। আত্মারা সবাই তাঁকেই স্মরণ করে আর বলে নয়নহীনকে দিশা দেখাও প্রভু - একথা বলতে বলতে বুদ্ধির যোগ কিন্তু উপরের পরমপিতার দিকে চলে যায়। যাবতীয় রহস্য জানাতে পারেন একমাত্র উনি, যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। নির্বাণধামকেই মুক্তিধাম বলা হয়। (কল্প) শুরুর প্রথম দিকে যে সব আত্মারা আসে, তারাই সর্বাগ্রে জীবনমুক্তিতে যায়। তারপরে যায় জীবনমুক্তি থেকে জীবনবন্ধে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, সত্যযুগ মানে যেখানে পবিত্রতা, সুখ, শান্তি, ইত্যাদি, ইত্যাদি। সত্যযুগ অর্থাৎ একটি অখণ্ড রাজ্য। যাকে আবার অদ্বৈত রাজ্যও

বলা হয়। এরপর (দ্বাপরে) আসে দ্বৈত-রাজ্য। অর্থাৎ আসুরী রাজ্য। শুরুতে যা ছিল কেবলমাত্র একটি ধর্ম, তখন তা হয়ে যায় অনেক ধর্মের। বাচ্চারা, তোমরা এই সৃষ্টি-চক্রের পাঠকে খুব সুন্দর রীতিতে গ্রহন করে নিজেদের পুরুষার্থ অনুসারে নিজেদের ক্রমিক বানাও। অন্য কোথাও এমন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ব্যাপারটাই যে নেই।

বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, এই কল্প-বৃক্ষের পরমাত্মা স্বয়ং একেবারে শীর্ষে অবস্থান করেন। কল্পের শুরুতে রচনা হয় সত্যযুগের। সত্যযুগের পরে আসে ত্রেতা। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সম্পূর্ণ সৃষ্টিজগতই পুরোনো ও তমোপ্রধানের দিকে যেতে থাকে। বর্তমানে তোমরা অতি পুরোনো অতি তমোপ্রধান দুনিয়াতে রয়েছো। কোনও হিসাবেই এই দুনিয়াকে এখন নতুন বলা চলে না। নতুন সৃষ্টির যুগ তো সত্যযুগ আর কলিযুগকে বলা হয় পুরোনো সৃষ্টি। যদিও তা পুরোনো হতে সময়ও লাগে অনেক। শুরুতে যা নতুন ছিল, তা এখন পুরোনো হয়েছে। আজকাল ভারতবাসীরা কিন্তু চায় যে, এমন একটা নতুন দুনিয়া হবে, যাকে বলা যাবে নতুন ভারত। আর তা হবে 'ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি'-র রাজ্য। (অর্থাৎ বিশ্বের সর্বশক্তিমান ক্ষমতার অধিকারী রাজ্য)। দেবী-দেবতারা যে রাজ্য স্থাপন করেন তা হয় 'ওয়ার্ল্ড অলমাইটী অথরিটি' রাজ্য। সমগ্র দুনিয়াতে তখন আর অন্য কোনও রাজ্য থাকে না।কোনও মনুষ্যই এমন 'অলমাইটী অথরিটি' অর্থাৎ সর্বশক্তিমান জ্ঞানের সাগর হতে পারে না। অর্থাৎ মনুষ্য পারে না জ্ঞানের সাগর হতে, সুখের সাগর হতে, ... এই মহিমা কেবলমাত্র এক ও একমাত্র পরমাত্মারই। তোমরা যে অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সা পেয়ে থাকো - তা একমাত্র ওনার থেকই। সেই বাবা স্বয়ং এখন বলছেন- কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই উনি এসে এই ভারত-ভূমিতেই সেই স্বর্গ-রাজ্য গড়ে তোলেন। অর্দ্ধ-কল্প বাদে মায়ার কাছে পরাজিত হয়ে, তোমরা সেই রাজ্য-ভাগ্য পদ খুইয়ে ফেলো। যা কেবল মানসিক হারই নয়, তোমাদের মন তখন যেন একেবারে ঘোড়ার মতন হয়ে যায়। ফলে মায়া সেই মনকেই উড়িয়ে নিয়ে যায়। তাই তো মায়াও বলে- বাহ্, আমার সেনাবাহিনীর কেউ অন্যের দলে যাবে কেমন করে ? খুব ভাল-ভাল রথী-মহারথীদেরও সে নিজের অধীনে করে নেয়। অথচ তোমাদের প্রকৃত যুদ্ধ তো মায়ার সাথেই। যদিও এই যুদ্ধে কোনও স্থুল অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যাপার নেই। এই যুদ্ধ কেবল মায়ার উপর জিত হাসিল করার। জাগতিক যুদ্ধ-বিগ্রহ তো চলতেই থাকে। পূর্বে যা ছিল তলোয়ার, পরে এলো বন্দুক, এখন তো কত প্রকারের বোম, অ্যাটম্-বোম ইত্যাদি কত কিছু।

বাচ্চারা, এখন তো তোমাদের বুদ্ধিতে এই ধারণা হয়েছে, একদা তোমরাই সেই দেবী-দেবতা ছিলে। অন্য কোনও সৎসঙ্গে এমনটা মেটেই বলতে পারবে না যে, তারাই একদা দেবী-দেবতা ছিল, এবং ৮৪-জন্মের চক্রও পুরো করছে তারা। তারা এমনও মনে করে না যে, বর্তমানে তারা অপবিত্র পতিত হয়ে আছে, সুতরাং আবার পবিত্র হতে হবে। বাচ্চারা, তোমরাও ওদের মতনই নয়নহীন ছিলে, যা কোনও স্থুল চোখের বিষয় নয়, এ হলো জ্ঞানের দিব্য-চক্ষুর কথা। আত্মা তার প্রকৃত পিতাকেই ভুলে গেছে এখন। জাগতিক সন্ন্যাসীরা অনেকেই আবার আত্মাকেই পরমাত্মা বলে। তাই বাবা এসে নিজের বাচ্চাদের তৃতীয় নয়নের উন্মোচন করান। কিন্তু লোকেরা দেবতাদের চিত্র ও মূর্তিতে তৃতীয় নয়নের ব্যবহার করে। যেমন ভাবে অযথা বিষ্ণুর হাতে নানা অলংকার দেখিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভাবেই দেবতাদেরও তৃতীয় নয়ন দেখায় তারা। কিন্তু সেই তৃতীয় নয়নের উন্মোচনই তো হয় না। সত্যযুগে যদি এসব কিছুর জ্ঞান থাকতো, তবে কি আর এভাবে পতন হোতো, আর না তো সেই খুশীর রাজ্য-সৌভাগ্য খুইয়ে এমন নরক-বাসী হতে হতো ? এই জ্ঞানের প্রাপ্তি কেবল এই

সময়কালেই হয়। একমাত্র তোমরা মিষ্টি-মিষ্টি অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারাই একথা জানো। ৫-হাজার বর্ষ বাদে আবার তোমরা মিলিত হয়েছো তোমাদের প্রকৃত বাবার সাথে। পূর্ব-কল্পের মতন আবার নিজেদের রাজ্য-সৌভাগ্য নেবার জন্য। এরপর আবারও ৫-হাজার বর্ষ বাদে এভাবেই আসতে হবে। যেহেতু তোমরাই যে সেই 'অল-রাউণ্ডার' এ্যাক্টর। তোমরাই দেবতা হও, তোমরাই আবার ক্ষত্রিয় হও, সেই তোমরাই এখন আবার ব্রাহ্মণ হয়েছো। এই বিশেষ জ্ঞান আর কারও নেই।

গীতা পাঠশালা অর্থাৎ ভগবানের পাঠশালা। এখানে যা কিছু বলা হয় তা 'ভগবান উবাচঃ'। কিন্তু অজ্ঞানী লোকেরা সেখানে কৃষ্ণের নাম বসিয়ে দিয়েছে। কৃষ্ণ ভগবান উবাচঃ- একথা তো আর হতে পারে না। কৃষ্ণ তো শিশু। তার চরিত্রেও কত কলঙ্ক লাগানো হয়েছে। এমনও বলা হয়েছে, কৃষ্ণের কত অনেক বাচ্চা ছিল, কত-শত রাণীকে হরণ করেছে। কিন্তু এখানে তো তোমরা নিজেরাই দৌড়ে-দৌড়ে আসো, কেউ তো তোমাদের জোর করে নিয়ে আসে না। গভার্নমেন্টের রাজ্যে যদি কেউ কারওকে জোর করে নিয়ে আসে, তার বিরুদ্ধে তখন মোকদ্দমা চলে। এটাই এখানকার বিস্ময়, এখানে কত অনেক বাচ্চা আসে, তাদের যোগ-ভাট্টী-ও হয় এখানে। বৃদ্ধ, যুবক, বাচ্চা অর্থাৎ আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সব রকমেরই তারা নিজেরাই দৌড়ে-দৌড়ে আসে এখানে। কেউ কেউ পুরো পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সমেত আসে এখানে। সেখানে কৃষ্ণের সাথে এই ব্যাপারকে মিলিয়ে সবকিছু উল্টো-পাল্টা করে দিয়েছে অজ্ঞানীরা। খবরের কাগজগুলিতেও এসব নিয়ে ধূমধাম পড়ে গেছিল। এমন কি আমেরিকার খবরের কাগজেও ছাপা হয়েছিল যে, কলকাতার এক জহুরী ঘোষণা করেছে, তার ১৬১০৮ রাণী চাই, বর্তমানে এমন ৪০০ রাণীর জোগাড় হয়েছে। এমনই বিচিত্র খেলা এটা। 'নাথিং নিউ'-নতুন কিছু নয় (আশ্চর্যের কিছু নয়)। কল্প-বাদে আবারও এমন ঘটবে। তোমাদের যোগ-ভাট্টীও এভাবেই হবে তখনও। তোমরা নিজেরাই তা দেখতে পাচ্ছো, কিভাবে এই স্থাপনা কার্য এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে কিভাবে তোমরা সাধারণ মনুষ্য থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছো। 'জীবনমুক্তি'-দাতাকে নিজের করে নিতে পারলে, সেকেণ্ডেই তুমি ওনার অবিনাশী আশীর্ব্বাদী-বর্সার অধিকারী হয়ে যাও। জনক রাজারও সেকেণ্ডেই সাক্ষ্যাৎকার হয়েছিল। তাই তো লোকেরাও বলে, জনক রাজার মতন আমাকেও মুহূর্তেই সেই জ্ঞান দাও। কিন্তু জনক রাজা তার রাজত্ব পেয়েছিল ত্রেতাযুগে এসে।

বাচ্চাদেরকে সর্বপ্রথমেই বাবা বোঝান- বাচ্চারা, সর্বাগ্রে এই নিশ্চয়তাই আনতে হবে মন-বুদ্ধিতে, তোমাদের সামনে কে বসে আছেন ? যেমন শিব-মন্দিরের সামনে ষাঁড়ের মূর্তি রাখা হয়। লোকেরা সেই ষাঁড়ের উপর চড়ে বসে, নিরাকার শিব তো আর ষাঁড়ের পিঠে চড়বে না! তাই দেখানো হয়, শংকর বসে আছে ষাঁড়ের পিঠে। অথচ, এসবের মর্মার্থ কিছুই বোঝে না লোকেরা। আবার গীতের মাধ্যমে তারা এও বলে, "নয়ন হীনকে দিশা দেখাও প্রভু, আমরা যে এখন বুদ্ধিহীন-দৃষ্টিহীন।" এখন তো প্রজার দ্বারা প্রজা শাষিত রাজ্য। পূর্বে যা ছিল রাজার দ্বারা শাষিত। কেউ ভীষণ কোনও বিকর্ম করলে, রাজা তার বিচার করতেন। এখন প্রজারাই প্রজাদের বিচার করে। প্রজারা নিজেরাই একে অপরের বিচারক। সত্যি, কি আশ্চর্যের নিয়ম এটা। এমনই আশ্চর্যের অসীম-বেহদের এই নাটক। যা কেবল তোমরাই তা বুঝতে পারো, অন্যেরা কেউ এসবের কিছুই বলতে পারবে না। টিক্-টিক্ করে উঁকুনের গতিতে এই অবিনাশী ড্রামার চিত্রপট ক্রমান্বয়ে ঘুরেই চলেছে। এই ভাবেই দুনিয়ার চক্র ঘুরতে ঘুরতেই আবার পূর্ব-স্থানে ফিরে আসে। বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চের লোকেরা এই বিশ্ব-নাটকের হিস্ট্রী-জিওগ্রাফী কিছুই জানে না। তাই তো তারা এমন অবুঝের মতন বলে থাকে, গাছের

পাতাও নড়ে ঈশ্বরের ইচ্ছায়। যদিও এটা সম্পূর্ণ ড্রামার ব্যাপার। যদি একটা মাছিও তোমার সামনে দিয়ে উড়ে যায়, সেটারও পুনরাবৃত্তি হবে আবার ৫-হাজার বর্ষ বাদে। এই অবিনাশী ড্রামাকে বুঝতে হবে সঠিক ভাবে। যারা প্রকৃত মানুষ হবে কেবল তারাই তা বুঝতে পারবে। কত সহজ-সরল-সুন্দর ও স্পষ্ট ভাবে বাবা বুঝিয়ে দিচ্ছেন বাচ্চাদের। এক ও একমাত্র এই বাবা-ই 'অলমাইটী অথরিটি'। বাবা জানাচ্ছেন, তিনিও এই ড্রামার বন্ধনে বাঁধা পড়ে আছেন। তাই স্বয়ং ওনাকেই আসতে হয়, পতিতদেরকে পবিত্র বানাবার জন্য। বাচ্চারা, এখন বাবার সাথে যোগের দ্বারা তোমরা যে শক্তি অর্জন করছো, তা মায়াকে হারিয়ে বিজয় পাবার জন্য। মায়া তোমাদের এমনই শত্রু যে, তোমাদেরকে একেবারে কাঙাল বানিয়ে দিয়েছে। ফলে, এখন তোমাদের না আছে স্বাস্থ্য, না আছে কোনও সম্পদ। কিন্তু এখন তোমরা বুঝতে পারছো, ধীরে ধীরে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে চলেছো। সেখানে তোমাদের স্বাস্থ্য, সম্পদ, খুশী ইত্যাদি সবকিছুই থাকবে।

বাচ্চারা, তোমরাই তো পরমাত্মার উদ্দেশ্যে বলতে থাকো- বাবা এসে দিশা দেখাও, ক্ষমা করো প্রভু, এসে আমাদেরকে মুক্তি-জীবনমুক্তি দাও। তোমাদের আত্মা-ই তো এসব বলে - ও বাবা, তুমি এসে আমাদের এই দুঃখ মোচন করে স্বর্গ-রাজ্যের মতন সুখী বানিয়ে দাও। তাই তো এই বাবাকে বলা হয়, 'দুঃখ হরণকারী' - 'সুখ প্রদানকারী'! একবার সুখী বানিয়ে দিলে এরপরে স্বর্গ-রাজ্যে ওনাকে আর স্মরণ করার প্রয়োজনই নেই। উনি যে বাবা, তাই সকল বাচ্চাদেরকেই উনি সুখী বানান। সমাজে পূর্বে এই প্রথা প্রচলিত ছিল যে, ৬০ বছর বয়সে রাজ্য-ভাগ্য যা কিছু তা বাচ্চাদের সমর্পণ করে স্বয়ং বাণপ্রস্থের উদ্দেশ্যে যাত্রা করত। এই উদাহরণ দিয়ে অসীম-বেহদের বাবা বলছেন- "বাচ্চারা, আমি বিলক্ষণ জানি, রাবণ-মায়া তোমাদের খুব দুঃখী করে রেখেছে, তাই এখন আমি এসেছি তোমাদেরকে নিয়ে যাবার জন্য। নির্বাণধাম যাওয়া আর বানপ্রস্থে যাওয়া একই ব্যাপার। বানপ্রস্থ অর্থাৎ নির্বাক শব্দহীন স্থান, সুইট সাইলেন্স হোম। সেখান থেকে তোমরা যাবে তোমাদের নিজেদের প্রিয় রাজধানীতে। বর্তমানে তোমরা আছো দুঃখধামে। বাচ্চারা, তোমরাই বলো - বাবা আমরা নিজেরা যেমন স্বদর্শন চক্রধারী হচ্ছি, অন্যদেরকেও তেমনি হতে সহযোগ করছি। (বাবা জানান) - এর সম্পূর্ণতা আসে একেবারে অন্তিম পর্যায়ে। কিন্তু (অজ্ঞানী) লোকেরা বলে- স্বদর্শণ চক্রধারী কেবল বিষ্ণু ও কৃষ্ণ। কিন্তু তা কি করে সম্ভব ? একথা কেবল তোমরাই বুঝতে পারবে। যারা স্বদর্শণ চক্রধারী হয়, সেই নেশার ঘোর থাকে যে - এখন শিববাবা স্বয়ং আমাদের স্বদর্শণ-চক্রধারী বানাচ্ছেন। অন্তিমে আমরাই সম্পূর্ণ হবো। আর এই স্বদর্শণ চক্রকেই দেবতাদের অলংকার হিসাবে দেখানো হয় যেহেতু তোমরা এখনও সম্পূর্ণ (দেবতা) হয়ে উঠতে পারোনি, তাই। যেহেতু এখন সেই অলংকার তোমাদের হাতে শোভা পাবে না। দেবতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ, তাই তাদের হাতে তা দেখানো হয়। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা ও বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণ ও ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা নমন জানাচ্ছেন ওনার ঈশ্বরীয় সন্তানদের।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) অসীম-বেহদের ড্রামার রহস্যকে বুদ্ধিতে রেখে 'নাথিং নিউ'-র পাঠকে পাক্কা করতে হবে। নির্বাক্ দুনিয়ায় অবস্থান বাণপ্রস্থ অবস্থায় পৌঁছতে হবে।

২) মায়ার মতন (শক্তিশালী) শত্রুকে জয় করার জন্য সর্বশক্তিমান বাবার থেকে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। জ্ঞান নেত্রহীন আত্মাদের জ্ঞান-নেত্রের উন্মোচন ঘটাতে হবে।

বরদান :- সহন-শক্তির কবচ ধারণ করে, সম্পূর্ণ স্টেজের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে যাওয়া বিঘ্ন-জিত ভবঃ

ব্যাখ্যা :- নিজের সম্পূর্ণ স্টেজের দিকে এগোতে থাকা অর্থাৎ সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত করার লক্ষ্যে উদাসীনতার রং-ঢংকে ঝেড়ে ফেলে সহনশক্তিতে শক্তিশালী হও। এই সহনশক্তিই সর্বপ্রকার বাধা-বিঘ্ন রক্ষাকারী কবচ। এই কবচ ধারণ করতে না পারলে সে দুর্বলই থেকে যায়। ফলে, বাবার কথাই বাবাকে শোনায়। কখনও তারা খুব উৎসাহ উদ্দীপনায় আবার কখনও বা খুব হতাশায়। এখন এই ওঠা-নামার সিঁড়িকে ত্যাগ করে যদি সদা উৎসাহ-উদ্দীপনায় থাকতে পারো, তবেই সম্পূর্ণ স্টেজের সমীপে পৌঁছে যাবে।

স্লোগান : - স্মরণ আর সেবার শক্তিতে অনেক বেশী আত্মাকে অনুকম্পা করাই দয়ালু হওয়া।